তাং 08 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

তথ্য ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

170

১৮

আই কিউ তত্ত্ব কি

বছর দুই আগে এ পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রলেখক জানতে চেয়েছিলেন আই কিউ (বুদ্ধি-সংখ্যা, বুদ্ধি-ক্ষমতা বা বুদ্ধ্যঙ্ক) বিষয়টা সত্য না মিথ্যা, তখনথেকেই আমার ইচ্ছা ছিল আই কিউ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভের পর এ বিষয়ে একটা নিবন্ধ রচনা করব। এতদিন পর সে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।

বুদ্ধি-ক্ষমতা বা আই কিউ সম্পর্কে পণ্ডিত সমাজ অনেক দিন ধরেই আলোচনা, বিতর্ক ও গবেষণায় নিরত আছেন। আই কিউ কথাটাকে প্রথমে একটু ব্যাখ্যা করে নেয়া যেতে পারে। ইংরেজিতে একে I. Q. বা Intelligence Quotient বলার কারণ হচ্ছে, এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সূত্র অনুসারে মানুষের বুদ্ধি-ক্ষমতাকে সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য একটা ভাগফল বা Quotient নির্ণয় করতে হয়। আই, কিউ নামকরণের এটাই কারণ।

আই কিউ কথাটা এখন আমাদের দেশে বহুল প্রচার লাভ করেছে। অনেক ভর্তি পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নানা রকম সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন, ধাঁধা প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। এ ধরনের প্রশ্নাবলী আগে সাধারণ জ্ঞান (Quiz) প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। এখন তা আই কিউ নামে পরিচিত হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে অর্থাৎ এদেশী আই কিউ বিষয়ে অনেক গ্রন্থাদি ভারতে ও বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লী ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত অনেক ইংরেজি ও বাংলার বই ঢাকা থেকে বেনামে পুনঃ প্রকাশিতও হয়েছে। তবে এ সকল গ্রন্থে ও পরীক্ষাসমূহে আই কিউ কথাটিকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় আমাদের আলোচ্য বিষয় তা থেকে ভিন্নতর।

বিজ্ঞানীদের আলোচনায় আই কিউ কথাটি অন্য এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন শিক্ষা মনস্তত্ত্ববিদ মনে করেন যে এক একজন মানুষের বুদ্ধির-ক্ষমতা বা মাত্রা এক এক রকম। তারা বলেন, এই ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি-ক্ষমতা মানুষ জন্মসূত্রে লাভ করে এবং তাদের মত অনুসারে নিজের চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানসাধনা, বিদ্যাভ্যাস, অভিজ্ঞতা অর্জন কোন কিছু দ্বারাই এই তথাকথিত বুদ্ধি-ক্ষমতা বা আই কিউকে পরিবর্তিত করা যায় না অর্থাৎ বাড়ানো যায় না, কমানোও যায় না। অনেক বিজ্ঞানীই এ তত্ত্বকে মানতে অস্বীকার করেছেন। অনেকে এটাকে অবিজ্ঞান বলেছেন। কিন্তু এ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য আধুনিক জীববিদ্যা, মানুষের শরীরবিদ্যা, মস্তিষ্কের গঠন, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যপদ্ধতি, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় যাঁরা আয়ত্ত করেছেন তাঁরা জানেন যে, সব মানুষের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা সমান। একটি শিশু জন্মসূত্রে যে দৈহিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে তা হল দেহ, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতি। একটি স্বাভাবিক শিশু বুদ্ধিক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না, মস্তিষ্কের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এ মস্তিষ্কের ক্ষমতা নির্ভর করে স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাসের ওপর। এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর বিন্যাস সব শিশুর ক্ষেত্রেই হুবহু একই রকম বা প্রায় একই রকম। মানব শিশু যখন ক্রমে বড় হতে থাকে তখন সে যে পরিমাণে জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে সে পরিমাণে তার বুদ্ধি বাড়তে থাকে। মানুষের সামগ্রিক জ্ঞানের সুসংগঠিত সুসংবাদ ও সঙ্গতিপূর্ণ প্রকাশকেই বুদ্ধি নামে অভিহিত করা হয়। এ বুদ্ধি তাই নির্ভর করে একজন মানুষের নিজের শেখা জ্ঞান, বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার ওপর। তাই যে কোন মানুষ চেষ্টা দ্বারা তার জ্ঞান যেমন বাড়াতে পারে তেমনিভাবে বাড়াতে পারে তার বুদ্ধিকে।

কিন্তু এ সহজ কথাটা বুদ্ধি-ক্ষমতা তত্ত্বের প্রবক্তারা বুঝতে চান না। না বুঝতে চাওয়ার অবশ্য কারণও আছে। এ তত্ত্বের যে অনুসিদ্ধান্তটি বাস্তব গুরুত্বসম্পন্ন তা হল, ঐ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, বুদ্ধি-ক্ষমতা পরিমাপ করলে দেখা যায় যে অভিজাত বংশীয়দের বুদ্ধি-ক্ষমতা বেশী, সাধারণ স্তরের মানুষদের বুদ্ধি-ক্ষমতা কম। ঐ তত্ত্বের লণ্ডনবাসী প্রবক্তারা বলেন যে, ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানদের বুদ্ধি-ক্ষমতা (আই কিউ) কম; ধনীর সন্তানদের বুদ্ধি-ক্ষমতা বেশী। আবার ঐ তত্ত্বের মার্কিন প্রবক্তারা বলে থাকেন যে, মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের বুদ্ধি-ক্ষমতা বেশী, মার্কিন নিগ্রোদের বুদ্ধির-ক্ষমতা কম। অবশ্য অনেক সুস্থ বুদ্ধির বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে আই কিউ তত্ত্বের প্রবক্তাদের গাণিতিক হিসাবে ভুলভ্রান্তি আছে, অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণারও প্রমাণ আছে, তাই তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, মার্কিন পণ্ডিত H. P. Taylor প্রচুর গবেষণা করে The I,Q, Game নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করেছেন যে আই কিউ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা প্রমাণ করার জন্য যে সব পরিসংখ্যানমূলক হিসাব উপস্থিত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। এ-ছাড়া, ইচ্ছাকৃত প্রতারণারও দৃষ্টান্ত আছে, একজন বৃটিশ শিক্ষাবিদ সিসিল বার্ট (Cecil Bert) ১৯৪০-এর দশকে স্থির করলেন যে আই কিউ বা বুদ্ধি-ক্ষমতা জন্মসূত্রে পাওয়া যায় কিনা এবং এক একজনের আই কিউ জন্মসূত্রেই স্থির হয়ে যায় কিনা তা বিশেষ ধরনের গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করবেন। তিনি অনেকগুলো যমজ সন্তানের তালিকা সংগ্রহ করলেন যারা জন্মকাল থেকেই কোন না কোন কারণে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছে। সিসিল বার্ট স্থির করলেন, ঐ যমজ সন্তানদের প্রতি জোড়ার জন্ম ইতিহাস এক। কিন্তু তাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকমের। যদি আই কিউ জন্মগতভাবে স্থির হয়ে যায় তবে প্রতি জোড়া যমজের আই কিউ একই রকমের হবে। আর যদি শিক্ষা দ্বারা আই কিউ বা বুদ্ধির ক্ষমতা প্রভাবিত হয় তবে যমজের দুই সন্তানের আই কিউ দুই রকম হতে পারবে। সিসিল বার্ট, অনুমান করা যায়, অনেক ধৈর্য ও পরিশ্রমসহকারে অনেক জোড়া যমজের আই কিউ হিসাব করলেন। দেখতে পেলেন, প্রতি জোড়া যমজের আই কিউ আশ্চর্য রকম সদৃশ, প্রায় হুবহু এক রকম। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, আই, কিউ অবশ্যই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। অন্য বিজ্ঞানীরা সিসিল

বিজ্ঞানসম্মত?

আবদুল হালিম

বার্টের সিদ্ধান্তকে না মানলেও, তাঁর গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞানের গলায় একটা কাঁটার মতো বিঁধে রইল। ইতিমধ্যে সিসিল বার্ট শিক্ষাবিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদান রাখার কারণে বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে উক্ত খেতাব লাভ করলেন।

প্রায় তিরিশ বছর পর একজন বিজ্ঞানীর মনে সিসিল বার্টের গাণিতিক হিসাবগুলো সন্দেহের উদ্রেক করল। তিনি লক্ষ্য করলেন, তত্ত্বগতভাবে যেমন ফল পাওয়া দরকার সিসিল বার্টের হিসাবে নিখুঁতভাবে ঠিক ঐ ফলই পাওয়া যাচ্ছে। এতে তিনি সন্দিহান হয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন এবং অচিরেই আবিষ্কার করলেন যে, সিসিল বার্ট আগাগোড়া প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কোন যমজ নিয়ে গবেষণা হয়নি, কোন তথ্য বা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়নি, সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ, বর্গমূল, বর্গসমষ্টি ইত্যাদি নির্ণয় করে শেষে একটা ফল বের করে বলা হয়েছে---এই দেখ, উত্তর মিলে গেছে। সিসিল বার্টের প্রতারণা যিনি উদ্ঘাটন করলেন, আশ্চর্যজনকভাবে পণ্ডিত সমাজ তাঁরই ওপর রুষ্ট হলেন সিসিল বার্টের মত সম্মানিত ব্যক্তির নামে অপবাদ দেয়ার জন্য। অবশেষে যখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল যে সিসিল বার্ট সত্যিই প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন তখনও আই কিউ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মত পরিবর্তিত হল না। তাঁরা আবার এক নতুন যুক্তি বের করলেন।

আই কিউ তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, এক একজন মানুষের আই কিউ জন্মলগ্নে যা থাকে; সারাজীবনে তার পরিবর্তন হয় না: তাঁরা বলেন, পরীক্ষা করে এক একজন মানুষের আই কিউ নির্ণয় করা যায়। আই কিউ নির্ণয়ের পদ্ধতিটা নিম্নরূপ।

আই কিউ নির্ণয়ের জন্য কতগুলো প্রশ্নপত্র তৈরী করা থাকে। এক এক বয়সের ছেলেমেয়ের জন্য এক এক রকমের প্রশ্ন। যেমন ৬ বছরের ছেলেমেয়ের জন্য একটা প্রশ্নপত্র। ৭ বছরের ছেলেমেয়ের জন্য আরেকটা প্রশ্নপত্র। ৮ বছরের জন্য অন্য একটা--এ রকম। এখন মনে করা যাক, একটি ছেলে বা মেয়ের আই কিউ নির্ণয় করতে হবে। তখন তার কাছাকাছি বয়সের একটা প্রশ্নপত্র তাকে দেয়া হয়। যেমন আট **বছরের মেয়েকে ৮ বছরের উপযুক্ত প্রশ্নপত্র দেয়া হল।** যদি সে তার পুরো উত্তর দিতে পারে তবে তাকে ক্রমানুয়ে ৯ বা ১০ বছরের উপযুক্ত প্রশ্নপত্র দেয়া হবে। মনে করা যাক সে ১০ বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পারল কিন্তু ১১ বছরের প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পারল না। তখন ধরা হবে, তার মানসিক বয়স ১০ বছর। কিন্তু তার প্রকৃত বা শারীরিক বয়স আমরা জানি, ৮ বছর। এ অবস্থায় তার আই কিউ হবে:

$\frac{১০}{৮} \times ১০০ = ১২৫$। সূত্রটি হচ্ছে: আই কিউ $= \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{শারীরিক বয়স}} \times ১০০$।

যদি দেখা যায়, একটি ছেলের বয়স ৮ কিন্তু সে ৬ বছরের চেয়ে ওপরের প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পারে না, তখন বলা হবে, তার মানসিক বয়স ৬। এবং তার আই কিউ হবে: $\frac{৬}{৮} \times ১০০ =$ ৭৫। এখন অবশ্য নতুন পদ্ধতিতেও আই কিউ হিসাব করা হয়। আই কিউ তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন যে এক একজন ব্যক্তির আই কিউ সুনির্দিষ্ট থাকে এবং তাকে বাড়ানো যায় না। অবশ্য যাঁরা এ তত্ত্বের বিরোধী তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে আই কিউ সহজেই বাড়ানো যায়। আই কিউ নির্ণয়ের জন্য যে সব প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় সে প্রশ্নের উত্তরের সাথে পরিচিতি লাভ করার সাথে সাথে আই কিউ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আই কিউ নিরূপণের জন্য সাধারণত: অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন করা হয়। যে সামাজিক স্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয় তার থেকে স্বতন্ত্র সমাজের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ঐসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে ভিন্ন সমাজের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি কম বা আই কিউ কম। যেমন, একটি মার্কিন আই কিউ পরীক্ষায় ৬ বছরের ছেলে বা মেয়েকে বলা হয় ছবি দেখে তার পুরো বর্ণনা দিতে অথবা ছবির খণ্ডাংশ দেখে বলতে হয় জুতা, খরগোস, দস্তানা বা চায়ের পটের কোন অংশ বিলুপ্ত হয়েছে।

এধরনের প্রশ্নের উত্তর আমেরিকার ছেলেমেয়েরা যত সহজে দিতে পারবে, এশিয়া-আফ্রিকার কোন গ্রাম্য বালক বালিকা তা নাও পারতে পারে। কিন্তু **তাতে প্রমাণ হয় না যে আমাদের দেশের** ছেলেমেয়েদের আই কিউ কম।

আফ্রিকার বনবাসী এক পিগমিকে একবার বনের বাইরে এনে দূরের কতগুলো ছাগলকে দেখান হল। ঐ বনবাসীরা ঘন অরণ্যের জন্য কখনও দূরের জিনিস দেখে চিনতে অভ্যস্ত হয়নি। ঐ পিগমি তাই ছাগলগুলোকে দেখে ভাবল যে ঐগুলো ছাগলের আকৃতির ছোট ছোট পোকা। কারণ, দূরের জিনিস যে ছোট দেখায় এ ধারণাই তার হয়নি। কিন্তু তার অর্থ এই না যে পিগমিদের আই কিউ কম। ঐ বনবাসী পিগমিরা তাদের বনের প্রত্যেকটি বৃক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে, বলতে গেলে প্রত্যেকটি বৃক্ষকে তারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করে তার পরিচয় মনে রাখে। মার্কিন পণ্ডিতদের আই কিউ এক্ষেত্রে কোন কাজে লাগবে কি? পিগমিরা জানে, বনের কোন অংশে কোন প্রাণী কখন পানি খেতে আসে, কোন পথ দিয়ে তারা যাতায়াত করে। ঐ জ্ঞানের সাহায্যে পশু শিকার করে তারা বেঁচে থাকে। অতএব তাদের আই কিউ যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত একথা স্বীকার করতেই হয়। ঐ বনে কোন শ্বেতাঙ্গ উপস্থিত হলে শুধু অজ্ঞতার কারণেই তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করবেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে তার আই কিউ কম। আমেরিকার পটভূমিতে স্থাপন করলে দেখা যাবে তার আই কিউ অত্যন্ত উন্নত। একথাগুলো আই কিউ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার।

সবকিছু বিচার করে আমরা তাই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আই কিউ সম্পর্কিত তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও পুরোপুরি প্রতারণাপূর্ণ। ইউরোপ-আমেরিকার এক বৃহৎসংখ্যক যুক্তিবাদী পণ্ডিত ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে, আই কিউ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভুল ও অবৈজ্ঞানিক। আশার কথা এই যে, যুক্তিবাদীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।